# কেদার বাবার রহস্য সন্ধান - অজেয়

# Kedar Babar Rahassa Sandhane by Ajeo Ray

সকাল ন'টা নাগাদ বোলপুর শহরে নিজের ঘরে বসে একখানি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে চোখ বোলাচ্ছিল দীপক। জলপাইগুড়িতে একপাল বন্য হাতির উপদ্রবের খবরে তার নজর আটকে গেল। এই সময় পাশ থেকে তার ভাইপো ষোলো বছরের ছোটন মৃদুস্বরে ডাকল-কাকু।

‘উ?’ অন্যমনস্ক দীপকের জবাব।

‘তুমি কেদারবাবাকে দেখেছ?' বলল ছোটন।

‘হুম।' উত্তরটা দায়সারা। কারণ দীপকের মন তখন হস্তীযুথের তাণ্ডবের রোমহর্ষক বর্ণনায় মগ্ন। 'জানো কাকু, কেদারবাবার গোঁফটা না ফলস', বলল ছোটন। ‘ও।' ছোটনের কথা দীপকের মনের গভীরে ছোঁয় না। সে তখন ভাবছে—ইস, এই জন্যেই নামকরা কাগজগুলোর এত কাটতি। কোন দূর দেশের ইন্টারেস্টিং ঘটনা সব জোগাড় করে ছাপে। অবশ্য এর জন্য অনেক রিপোর্টার চাই। অর্থ চাই। বঙ্গবার্তা তা পাবে কোথায় ? তার সংগতি যে সামান্য।

‘সত্যি বলছি কাকু।' দীপকের রকম দেখে ছোটন ভাবে, কাকা বুঝি তার কথা অবিশ্বাস করছে। তাই সে এবার একটু জোর দিয়েই জানায়, 'আমি নিজের চোখে দেখেছি।

অ্যা, কী দেখেছিস?' দীপকের চমক ভাঙে। ‘কেদারবাবার গোঁফটা ফল। ‘মানে!’ কাগজ রেখে দীপক ঘুরে সোজা হয়ে বসে, কী করে জানলি?' বললাম না, আমি নিজে দেখেছি।' কীভাবে দেখলি?' ‘তালপুকুরের ধারে যে মস্ত আমগাছটা আছে ওটায় উঠেছিলুম কাল দুপুরে। যা আম ধরেছে না!'

‘ও, দুপুরে বাড়ি থেকে কেটেছিলি? গ্রীষ্মের ছুটিতে এই হচ্ছে? "প্লিজ কাকু, বাড়িতে বলে দিও না। আর কক্ষনো যাব না।' ‘হু, তা কী দেখলি শুনি?'

কাকার কাছে ভরসা পেয়ে ছোটন হাতমুখ নেড়ে উত্তেজিত চাপা স্বরে বলতে থাকে— “গাছটা দেখেছ তো কাকু, কী ঘন ডালপালা। মাঝামাঝি উঠে কয়েকটা আম পেড়ে ডালে বসে নুন দিয়ে চাখছি। বেশ পাতার আড়ালে বসেছি। গাছ পাহারা দেয় যে লোকটা সে ওই পুকুরের কাছেই থাকে। দেখতে পেলেই তাড়া করবে। তবে তখন বোধহয় ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ দেখি কেদারবাবা তার চেলাকে নিয়ে হাজির হলেন। আমার ভারি ভয় লাগে ওঁকে। বাপূরে ক লম্বা। আর কী গম্ভীর! ওঁর চেলাটাও শুনেছি খুব রাগী। আমি চুপচাপ লুকিয়ে বসে দেখতে লাগলুম।

‘দু'জনে ঘাট দিয়ে নেমে জলে হাত-পা ধুল। তারপর সাধু বসলেন ঘাটের বাঁধানো চাতালে। ওঁর সেই হরিণের চামড়ার আসনটা পেতে। মাথার পাগড়ি খুলে নেড়ে নেড়ে বাতাস খেতে লাগলেন। ওঁর শিষ্যও বসল কাছে। বোধহয় অনেক দূর থেকে হেঁটে এসে জিরোচ্ছিলেন। কমণ্ডলু থেকে জল খেলেন সাধু। চেলাও খেল। খানিক বাদে কেদারবাবা ফের মাথায় পাগড়ি বেঁধে পকেট না কোথেকে জানি একটা চিরুনি বের করে নিজের দাড়ি-গোফ আঁচড়াতে লাগলেন। আমগাছটা ঘাটের উল্টোদিকে। ওরা আমায় দেখতে পাচ্ছিল না। আমি কিন্তু বেশ দেখতে পাচ্ছিলুম ওদের। হঠাৎ দেখি সাধুর একদিকের গোঁফ খানিকটা ঝুলে পড়েছে। যেন নকল গোফ খুলে আলগা হয়ে গেছে। সাধু, মানে কোরবাৰা অমনি টপ করে তার গোফ আঙুল দিয়ে তুলে চেপে ধরে এদিক সেদিক তাকিয়ে উঠে গিয়ে বসলেন একটা ঝোপের আড়ালে। ওঁর শিষ্যও গেল পিছু পিছু তার ঝুলিটা নিয়ে। তারপর কী যে করল ঠিক দেখতে পেলুম না। একটুক্ষণ বাদে দু'জনে ফিরে এসে ফের ঘাটে বসল। তখন দেখি কেদারবাবার গোঁফ আগের মতন হয়ে গিয়েছে। গোফটা লাগিয়ে নিল নিশ্চয়ই। থিয়েটারে যেমন আঠা দিয়ে গোঁফ-দাড়ি লাগায়। কী মনে। হয় কাকু, উনি সত্যি সাধু না, ভণ্ড। সত্যি হলে নকল গোফ লাগাবেন কেন?”

‘তুই ঠিক দেখেছিস?' জিজ্ঞেস করে দীপক। হা কাকু। স্পষ্ট দেখলাম। গোঁফের একটা ধার খুলে ঝুলছিল।

‘ওরা গেল কখন?

‘খানিক বাদেই। ওরা দূরে চলে গেলে আমি নামলাম গাছ থেকে। খুব ভয় করছিল। ভণ্ড সাধু যদি দুষ্ট লোক হয়। তাই আগে নামিনি। ওদের মতলব কী কাকু? এখানে এসেছে কেন?' ছোটন উৎসুকভাবে চেয়ে থাকে দীপকের পানে। সে জানে তার কাকা একজন সাংবাদিক এবং সর্বদা নতুন নতুন খাবারের খোঁজে ঘোরে।

দীপক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ‘‘ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমি আরও ভেবে দেখি। তবে হ্যা, এ বিষয়ে আর কাউকে একটি কথাও বলিসনে।'

কেদারবাবাকে একবারই দেখেছে দীপক দিন পাঁচেক আগে। সাধুবাবা সেইদিনই সদ্য এসেছেন বোলপুরে। বোলপুর স্টেশনের এক প্রান্তে হরিণের চামড়া মাটিতে পেতে তার ওপর সোজা হয়ে বসেছিলেন সন্ন্যাসী। কাছে কম্বলের আসনে বসেছিল তার এক চেলা। সাধুবাবার চেহারাটি নজরে পড়ার মতো। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ। রং গৌর। খাড়া নাক। বড় বড় উজ্জ্বল চোখ। কপালে তেল সিঁদুরের ফোটা এবং ভস্মরেখা। মাথায় লম্বা চুলের ওপর গেরুয়া পাগড়ি জড়ানো। মুখে গো ও লম্বা দাড়ি। চুল-দাড়িতে কিঞ্চিৎ পাক ধরলেও দেহে বার্ধক্যের ছাপ নেই। পরনে হাঁটুল গেরুয়া আলখাল্লা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

সাধুর চেলাটির বয়স ঢের কম, যুবকই বলা চলে। তার গায়েও গেরুয়া আলখাল্লা। তাব মাথার চুল ছোট এবং সাদা কাপড়ের পাগড়ি। মুখে গোঁফ-দাড়ি নেই। মাঝারি লম্বা। গাট্টা জোয়ান। সাধুদের পাশে রাখা ছিল দুটি ঝোলা, দুটি কমণ্ডলু এবং দু'খানা মোটা তেল-চক'টকে বাঁশের লাঠি। অয়েকজন কৌতুহলী দশক অবাক হয়ে দেখছিল তাদের। সাধু উদাস স্থির নয়নে তাকিয়ে ছিলেন দূর আকাশের পানে। সাধুর সঙ্গীর দৃষ্টি কখন তার গুরুর ওপর, কখনও চকিতে ঘুরে আসছিল আশেপাশে।

দীপক আধমিনিটটাক থেমে থেমে নবাগত সাধু ও তার চেলার ওপর চোখ বুলিয়ে চলে গেছল নিজের কাজে।

ওই সাধুর আর সাক্ষাৎ না পেলেও ওঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর পৌঁছেছিল দীপকের কানে। সাধুটির নাম কেদারবাবা। ওর চেলার নাম হরি ব্রহ্মচারী। বোলপুর শহরে উনি দিব্যি জমিয়ে বসেছেন। কয়েক বাড়ি গীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠ ইত্যাদি করেছেন। আধ্যাত্মিক উপদেশ দেন। সেসব বিষয়ে আলোচনা করেন। বাংলা হিন্দি দুই ভাষাই খাসা বলেন। ভজন গানও করেন। স্টেশনে তাদের একদিনের বেশি কাটাতে হয়নি। বোলপুরের মন্দিরগুলি দর্শন করতে করতে মুখুজেদের প্রাচীন শিবমন্দির দেখে সাধুর ভারি পছন্দ হয় এবং আপাতত ওই মন্দির সংলগ্ন অতিথিশালায় চেলাসহ আশ্রয় নিয়েছেন। সাধারণত তিনি পাঠ-টাঠ বা গান করেন সকালবেলা। তারপর টো টো করে ঘুরে বেড়ান। ওই সময় প্রধানত শহরের কাছাকাছি গ্রামের মন্দির ও পুণ্যস্থানগুলি দেখে বেড়ান। হিন্দু মুসলমান বা যে কোনো সম্প্রদায়ের পুণ্যস্থান দেখা এবং সেগুলির ইতিহাস শোনায় নাকি তার বিশেষ আগ্রহ। কখনও বা নির্জন জায়গায় ধ্যানে বসেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

সাধুজি নাকি করতলের রেখা দেখে লোকের ভূত-ভবিষ্যৎও বলতে পারেন। তবে সহজে রাজি হন না এই বিদ্যা জাহির করতে।

দীপক কেদারবাবা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ বোধ করেনি। তবে একটা ব্যাপার শুনে সাধুর ওপর তার শ্রদ্ধা জেগেছিল। কেন্দারবাবা নাকি কোনো টাকাকড়ি বা দামি জিনিস প্রণামী হিসেবে গ্রহণ করেন না। নিজের ও শিষ্যের অতি সাদাসিধে আহারের প্রয়োজনে কিছু চাল আটা, সামান্য তরারি বা টল গ্রহণ করেন না।

কেদারবাবা সম্বন্ধে বোলপুরের বাসিন্দাদের রীতিমতো ভক্তি জেগেছে। তবে তার সঙ্গী শিষ্যটির ওপর অনেকেই বিরূপ। লোকটি নাকি বড় কাটখোটা। গুরুকে আগলে আগলে রাখে এবং অনেক সময় দর্শনপ্রার্থীদের কড়া ভাষায় হাঁকিয়ে দেয়।

দীপক চিন্তা করে কে এই সাধু এবং তার চেলা? ছদ্মবেশী চোর-ডাকাত নাকি? কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে এসেছেন এখানে। থানায় খবর দিই যদি? উহু, এত তাড়াতাড়ি করা উচিত হবে না। যদি ছোটনের চোখের ভুল হয়? মিছিমিছি এমন জঘন্য অপবাদ দিলে কেদারবাবার ভক্তরা দীপককে আর আস্ত রাখবে না। সুতরাং নিজে দেখেশুনে, প্রমাণ পেয়ে নিশ্চিত হয়ে তবে পুলিশে রিপোর্ট।

বিকেলে বঙ্গবার্তা’র পিওন এসে দীপককে জানাল, 'বাবু ডেকেছেন।' অর্থাৎ সম্পাদকের তলব।

‘বঙ্গবার্তা'র মালিক এবং সম্পাদক শ্রীকুঞ্জবিহারী মাইতি তার ছোট্ট অফিস কামরায় থমথমে হাঁড়িপানা মুখে চেয়ারে বসেছিলেন। কৈবল তিনি ফোসফোস করে নিশ্বাস ফেলছেন, ছটফট করছেন।

কুঞ্জবিহারী মাঝবয়সি। মাথায় খাটো, শ্যামবর্ণ, দৃঢ়কায় ব্যক্তি। পরনে ধুতি শার্ট। পাশের ঘরে ভবানী প্রেসের কাজ চলছে খটাখট শব্দে। ওই প্রেসেই ছাপা হয় বঙ্গবার্তা। ভবানী গ্রেসেরও মালিক কুঞ্জবিহারী। দীপক সম্পাদরে ঘরের দরজা ঠেলতেই তিনি হাঁক ছাড়লেন— 'এসো। কাম-ইন।'

পঞ্চ সামনের চেয়ারে বসতে না বসতেই কুঞ্জবাবু একখানা খবরের কাগজ তার সমুখে টেবিলে ফেলে দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'এই দেখ । দেখেছ?'

পিক এক নজরে দেখল, সেটি 'সমাচার'-এর সদ্য প্রকাশিত সংখ্যা। সমাচারও

বোলপুর থেকে প্রকাশিত হয়। এটিও বঙ্গবার্তার মতন একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এবং বঙ্গবার্তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

ওই সংখ্যাটি এখনও পড়েনি দীপক। তাই সম্পাদকের এত উত্তেজনার কারণটা ক—

-বুঝে থতমত ভাবে জিজ্ঞেস করল-“কী ব্যাপার?”

‘ব্যাপার এই।' খেকিয়ে উঠলেন বঙ্গবার্তার সম্পাদক এবং ওই সমাচার-এর প্রথম পৃষ্ঠার এক জায়গায় আঙুল ঠেকালেন। দীপক দেখল, কালো চৌকো মোটা দাগের ঘেরার মধ্যে বড় বড় হরফে ছাপা এক ঘোষণা। পাঠকদের জানানো হচ্ছে যে দু'সপ্তাহ পর থেকে সমাচার-এ প্রকাশিত হবে এক অভিনব কাহিনি। বিষয়-জনৈক পকেটমারের আত্মকথা।

‘এই স্টোরি বেতে শুরু করলে আর কি কেউ বঙ্গবার্তা কিনবে? সব পাঠক টেনে নেবে ওরা। হতাশ সুরে জানালেন কুঞ্জবিহারী। ‘এমন পকেটমার ওরা পেল কোথায়?” দীপক অবাক, নির্ঘাৎ নিজেরাই বানাবে।

হতে পারে। হয়তো দু-চার কথা শুনেছে কোনো পকেটমারের মুখে, বাকিটুকু হবে নিজেদের কারসাজি। পকেটমারটির আসল নাম না দিলেই হল। কে আর চ্যালেঞ্জ করছে? তা আমরাও তো বানাতে পারি এমন কিছু। আমাদের কি ইমাজিনেশন নেই? দেখো দীপক, এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান দরের কিছু ছাড়তে না পারলে বঙ্গবার্তা ডুববে। হুম খানিক 'ভুরু কুঁচকে গুম মেরে থেকে, নিজের কপালে বার কয়েক ডট পেনের টোকা মেরে কুঞ্জবিহারী বলে উঠলেন, "ননা, এত সহজে হার মানা চলবে না। ফাইট চাই ফাইট। একটা কিছু ভাব দীপক, খুব ইন্টারেস্টিং। ইয়াং-ম্যান, তুমি আমাদের বেস্ট রিপোর্টার। তোমার মাথা খেলে। পারলে তুমিই পারবে। আ-হু-ছা, প্রফেশনে রয়েছে বা রিটায়ার করেছে এমন কোনো ডাকাতের সঙ্গে তোমার চেনা নেই? তার কিছু লাইফ-হিস্ট্রি আদায় করতে পারলে বাকিটা তোমার কলমের জোর। ইচ্ছেমতে রং চড়াবে। ডাকাতের আত্মকাহিনি।' সমাচারকে টেক্কা দিতে বঙ্গবার্তার সম্পাদক বুঝি মরিয়া।

দীপকের মাথায় চকিতে খেলে যায় এক আইডিয়া। লোরবাৰা সম্বন্ধে যা সন্দেহ হচ্ছে তা যদি সত্যি হয়, মার দিয়া কেল্লা। দুর্দান্ত খবর হবে। সমাচার-এর পিপকেটুকে টক্কর দেবে অনায়াসে। সাধুকে স্বচক্ষে দেখছে গোটা বোলপুর। সুতরাং কেসটা জমবে বেশি। দীপক তার মনের ভাব লেশমাত্র প্রকাশ না করে শুধু বলল, "দেখি চেষ্টা করে, কী করা যায় ?

'হা, হাঁ, করো চেষ্টা। তবে মনে রেখো সময় খুব কম। কুঞ্জবিহারী দীপকের পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিলেন। দীপক উঠে পড়ল।

বাড়ি ফিরে দীপক ছোটনকে আড়ালে ডেকে বলল, "শোন্ কেদারবাবাকে ওয় করতে হবে। কোন কোন বাড়িতে যাচ্ছেন, কী করছেন? সমস্ত খুটিনাটি। আঁচ করতে হবে ওঁর আসল মতলবটা কী? কখনও তুই যাবি। কখনও আমি।'

পরদিন সকাল সাতটা নাগাদ মুখুজ্যে বাড়িতে হাজির হল দীপক।

এককালে মুখুজ্যেরা রীতিমতো ধনী পরিবার ছিল। এখন অবস্থা পড়ে গেছে একেবারে। শহরের এক কোণে পাঁচিলঘেরা মস্ত কম্পাউন্ডের মধ্যে তাদের দোতলা অট্টালিকা শিবমন্দির, অতিথিশালা, পূজামণ্ডপ ইত্যাদি। কিন্তু সর্বত্র জরার ছাপ। মেরামতির অভাবে বহু জায়গায় পাচিল ভাঙা দেয়াল পলস্তারা খসা, বাড়ির ফোকরে ফোকরে আছে বট-অশ্বথের চারা। একদা শৌখিন বাগান

এখন আগাছা-ভর্তি বাড়ির এলাশয় সুর দিয়ে গেছে চওড়া পাকা রাস্তা, অন্য ধারে একটা সরু গলিপথ।

হঙ্গারবাবা মন্দিরের সামনে খোলা বাঁধানো চাতালে বসেছিলেন বাৰু হয়ে। শিরপাড়া কা। দুই হাত হাঁটুতে ঠেকানো। মুদিত নয়ন। ইতিমধ্যে তিনটি স্থানীয় ভক্ত এসে আটছেন। তারা বসে আছেন সাধুবাবার কাছে। শিষ্য হয়ে কিছু দূরে ফুল তুলছে। দীপক গুটিগুটি গিয়ে বসল একপাশে। খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল সাধুকে।

একটু বাদেই কেদারবাবা চোখ খুলে মেঘমন্দ্র কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'জয় শংকর।" তারপর তিনি হাসিমুখে আগন্তুকদের মুখের ওপর একবার চোখ বোলালেন। সবাই হাতজোড় করে নতমস্তকে প্রণাম জানালেন সাধুজিকে। দীপকও তাই করল।

প্রথমেই কথা বললেন সোনা-রূপার বাবসায়ী নিবারণবাবু। আর্জি জানালেন যে আগামীকাল সাধুবাবা তার বাড়িতে গীতা পাঠ করলে তিনি কৃতার্থ হবেন। কেদারবাবা রাজি হলেন। আর একদফা প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলেন নিবারণবাবু।

এবার কেদারবাবার কাছে একটি আধ্যাত্মিক প্রশ্ন তুললেন পণ্ডিতমশাই। আলোচনা শুরু হল। চলল আধঘন্টাটাক। এর পর কেদারবাবাকে একবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন অপর এক ব্যবসায়ী খটমলজি। উদ্দেশ্য বোঝা গেল, বাড়ির কিছু লোকের হাত দেখানো অর্থাৎ ভাগ্য জানা। কেদারবাবা তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন না। খানিক চুপ করে থেকে - বললেন যে, পরে ভেবে স্থির করবেন যাওয়া সম্ভব হবে কিনা।

কেদারবাবা সবিনয়ে বললেন যে এখন তিনি বিদায় নেবেন। কারণ হরেন সাধুখা মশায়ের বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করবেন আজ সকালে।

অন্যান্যদের সঙ্গে দীপকও সাধুকে প্রণাম করে উঠে পড়ল। দীপক কিন্তু বাইরে গেল না। সামান্য ঘুরে ঢুকে পড়ল মুখুজ্যে বাড়ির অন্দরে। মুখুজ্যে গিন্নির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা আছে।

বিধবা সৌম্যদর্শন বৃদ্ধা মুখুজে পৃহিণী একা বসেছিলেন দোতলার বারান্দায়। দীপককে দেখে আহবান জানালেন—'এসো বাবা, অনেক দিন পরে। কেমন আছ? বাড়ির খবর ভালো?”

দীপক মুখুজ্যে গৃহিণীকে প্রণাম করে বসল কাছে। বলল, 'আয়ে ভালোই আছি। কেদারবাবাকে দেখতে এসেছিলাম।'

বাবাজির নাম শুনেই মুখুজ্যে গিন্নি কপালে জোড়হাত ঠেকালেন ভক্তিতে। বললেন, “আহা মহাত্মা ব্যক্তি। আমাদের পরম সৌভাগ্য এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। কিছুই তো সেবা করতে পারি না।

দীপক বুঝল মুখুজ্যে গিন্নিকে একেবারে বশ করে ফেলেছেন শোরবাবা। তার সম্বন্ধে কোনো বিরূপ আলোচনা এখানে চলবে না। সে এটা-সেটা কথার পর বলল, 'আচ্ছা মাসিমা, পুরনো আমলের পুরনো ডিজাইনের গয়না এখনও কিছু আছে আপনাদের?" ‘আছে বাবা সামান্যই। নাতনির বিয়ের জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছি। ওইটুকুই যা সম্বল।”

একদিন এসে দেখব। ওসব পুরনো ডিজাইন তো লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ব্যাঙ্কের লকার থেকে বাড়িতে আনলে খবর দেবেন আমায়।

‘গয়না ব্যাঙ্কে তো নেই। বাড়িতেই আছে, সিন্দুকে। তুমি যেদিন ইচ্ছে দেখতে পার।”

'আ, সেকি! বাড়িতে রেখেছেন। চোর-ডাকাতের কী উপদ্রব! সিন্দুক ভাঙতে কতক্ষণ? বাড়িতে একটিও সমর্থ পুরুষ নেই। বাড়ির জানলা দরজা অনেকগুলোই নড়বড়ে।'

‘আমার যে বাবা ব্যাঙ্কে লকার নেই। ‘আত্মীয়-স্বজন কারও লকারে রেখে দিন। ‘কাছাকাছি আত্মীয় বলতে এক ভাইপো আছে বর্ধমানে। তার লকার আছে শুনেছি। ‘বেশ, পাঠিয়ে দিন তার কাছে। আর যদি না পাঠাচ্ছেন, গয়নাগুলো বাড়ির অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখুন। চোর পড়লে প্রথমেই তো সিন্দুক খুঁজবে।

ভীত মুখুজ্যে গিন্নি বললেন, “ঠিক বলেছ বাবা, তাই রাখব লুকিয়ে।।

বাড়ি ফিরে দীপক ছোটনকে বলল, 'সাধুখাঁদের বাড়িতে এখন চণ্ডীপাঠ করবেন কেদারবাবা। তুই যা ওখানে। ভালো করে দেখেশুনে এসে রিপোর্ট করবি।।

কিঞ্চিৎ দমে গেল ছোটন। ডাংগুলি খেলার কী হবে? যা হোক গোয়েন্দাগিরির খাতিরে সে আজ আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত হল।

ঘণ্টা দুই বাদে ছোটন ফিরল ব্যাজার মুখে। অতি একঘেয়ে কেটেছে সাধুখাঁর বাড়িতে। পাঠ অবশ্য খুব জমেছিল। প্রচুর শ্রোতা হয়েছিল। তবে ছোটন মাথামুণ্ডু বোঝেনি ওসব তত্ত্বকথা। তার বয়সি কেট অতক্ষণ থাকেনি। একটাই নতুন খবর —বোলপুর থানার দারোগার স্ত্রী পাঠ শুনে ঝুলোঝুলি করেছেন সাধুবাবাকে একবার তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কেন্দারবাবা প্রথমটায় রাজি হচ্ছিলেন না। অবশেষে বলেছেন যে, কিছুদিন বাদে যাবেন।

দীপক ভাবল, সেরেছে। স্বয়ং দারোগা গিন্নি কুপোকাৎ। এখন ওই সাধুর নামে নালিশ করলে দারোগাসাহেব উল্টে তাকেই না হেনস্থা করেন? মোক্ষম প্রমাণ না মিললে কেদারবাবার বিরুদ্ধে থানায় নালিশ করে লাভ নেই।

ছোটন জানাল যে, আসছে কাল নিবারণ স্বর্ণকারের বাড়ি সে পাঠ শুনতে যেতে পারবে না। কারণ ওদের বাড়ির ছেলে বঙ্কার সঙ্গে মাত্র তিন দিন আগে তার খুব একচোট হয়ে গেছে। আড়ি চলছে। দীপক অগত্যা ভেবে বলল, “তাহলে ওখানে তুমাকে পাঠাই।”

ছোটনের বছর তিনেকের ছোট বোন কুমাকে গোপনে ডেকে দীপক অল্প কথায় বুঝিয়ে দিল তার প্ল্যান। ঝুমা শুনেই একপায়ে খাড়া। চোখ বড় বড় করে বলল, বাবাজির দড়ি ধরে একবার টান মেরে দেখব নাকি, সত্যি না ফল।'

টানবি কী ভাবে?' ছোটনের প্রশ্ন। ঝুমা বলল, “কেন, প্রণাম করতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খাবার ভান করে ওঁর দাড়ি ধরে ঝুলে পড়ব।' 'না, না, বাধা দিল দীপক, যদি খুব শক্ত করে লাগানো থাকে? যদি ঠিকমতো টানতে

পারিস, খুলবে না। আর যদি দাড়িটা সত্যি হয়? হয়তো দু-একগাছা মাত্র ছিড়ে আসবে। তখন মহা কেলেংকারি হানে। ভক্তরা বকেয়কে তাড়িয়ে দেবে তোকে।

কেদারবাবাও তোর। মতলব আঁচ করে সাবধান হয়ে যাবে। হয়তো পালাবে। উধাও হবে বোলপুর থেকে।

'তাবে তো ভালোই হয়,' বলল মা।

দীপক ঘাড় নাড়ে। তার আসল উদ্দেশ্য অবশ্য ভাঙে না। কেদারবাবা ঘাবড়ে গিয়ে কোনো দুষ্কর্ম না করে নিরামিষ পিট্রান দিলে তার বঙ্গবার্তায় লেখাটা যে জমবে না। ঠিক অপরাধ করার সময় ওকে হাতেনাতে ধরতে পারলে সোনায়-সোহাগা। আর তা নয়তো যনি চুরি-ডাকাতি খুন-খারাপি জাতীয় কিছু করে হাওয়া হল বাবাজি তখন সে পুলিশকে অনেক তথ্য জোগাতে পারবে। সাধুবাবার শরীরে কতগুলি বিশেষ চিহ্ন দীপক লক্ষ করে রেখেছে। সেই সূত্র ধরে পুলিশ হয়তো তখন খুজে বের করতে পারবে ওকে। দাগী অপরাধীদের গুটিনাটি বর্ণনা লেখা থাকে পুলিশের দপ্তরে। এসব খবর দিলেও জমে যাবে নেদারবার কাহিনি।

মা ফিরে এল একদম ভিন্ন মেজাজে। কেদারবাবার প্রশংসায় মুখর। আহা কী চমৎকার বলেন, আর খুব পণ্ডিত। একটা গান গাইলেন। কী মিষ্টি গলা! উনি কক্ষনো চোর ছ্যাচড় হতে পারেন না।'

ছোটন রেগে বলল, ''জানিস অনেক ঘাঘু ক্রিমিনাল বেশ লেখাপড়া জানে। গান আনে। তাই তোর মতন হাঁদাদের ধোঁকা দেয়।'

ঝুমা তর্ক জোড়, ওঃ তুমি ভারি চালাক! কাকু, আমার কিন্তু মনে হয় না উনি খারাপ লোক।

তবে ঝুমার কাছে একটা দামি খবর পাওয়া গেল। খোলভুসির মস্ত কারবারি হাটিবাবুর স্ত্রী নাকি এক হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন হিমালয়ে কেদারবাবার মঠের জন। বাবাজি বলেছেন যে মঠের জন্য এখন অর্থের প্রয়োজন নেই, তবে তিনি একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার কথা চিন্তা করছেন। দরকার হলে সেই উদ্দেশ্যে নেবেন দান।

দীপক 'ভাবল ই, এবার মতলবটা টের পাওয়া যাচ্ছে, ধুরন্ধর ব্যক্তি। প্রথমে নির্লোভ মহাপুরুষ সাজছেন। এরপর অনাথ আশ্রমের নাম করে দেদার টা তুলে চম্পট দেবেন।

পর পর দুদিন সকালে দীপক কেদারবাবকে পর্যবেক্ষণ করতে টু মাল মুখুজ্যে বাড়িতে। দ্বিতীয় দিনে এক ভদ্রলোক এলেন কেদারবাবুর কাছে। মাঝবয়সি। শ্যামবর্ণ। পরনে হাফ-শার্ট ও খাটো ধুতি। পায়ে চল। মোটা বুরুশের মধ্যে গোফওলা জোয়ান রাশভারী চেহারা। লোকটিকে বোলপুরে কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারল না দীপক। ভদ্রলোক চারধার দেখে নিয়ে সাধুবাবাকে প্রণাম করে উঠোনের এক কোণে বসলেন এবং চুপচাপ অন্যদের সঙ্গে সাধুবাবার কথা শুনতে লাগলেন।

হবি ব্রহ্মচারী বেরিয়ে এল মন্দির থেকে। নতুন আগন্তুক। চট করে উঠে গিয়ে হরিকে ডেকে নিয়ে খানিক তফাতে গেল। নিচু স্বরে অল্প কথা হল দুজনে। অচেনা ভদ্রলোক ফের এসে বসলেন উঠোনে।

দীপকের কৌতুহল হল। সে সরে গিয়ে বসল নতুন লোকটির পাশে। নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, “কোথেকে আসছেন?”

ভলোক কিঞ্চিং ইতস্তত করে বললেন, ‘পাই।' ‘ও, সিউড়ি লাইন? বাবাকে দর্শন করতে এসেছেন?' ‘হ্যা, মানে বিশেষ প্রয়োজনও বটে। আমার এক মাত্র পুত্রটিকে নিয়ে বড়ই অশান্তি ভোগ করছি। তাই সাধুবাবার উপদেশ নিতে এসেছি, কোনো উপায় যদি বলেন? একটু গোপনে, কথা বলতে চাই।

‘কেদারবাবার কথা জানলেন কী ভাবে?” ‘আমার পরিচিত একজন বোলপুরে থাকেন, তার কাছে শুনলেম।'

ভদ্রলোক গম্ভীর বিরস মুখে নীরব হলেন। বোঝা গেল, অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন এবং 'আর বেশি কথা বলতে ইচ্ছুক নন।

আধঘন্টাটাক বসে দীপক উঠে পড়ল। তার মনে কেমন সন্দেহ। সে এক চক্কর ঘুরে হাজির হল বন্ধু পরাগের বাড়ি। পরাগদের বাড়ি দোতলা। ছাদে চিলেকোঠায় থাকে পরাগ। দীপক সোজা পরাগের কাছে হাজির হয়ে থোষণা করল, আমি তোর এখানে বসে একটা রিপোর্ট লিখব। বাড়িতে বড্ড গোলমাল, একগাদা কুটুম এসেছে, বউদির বাপের বাড়ির লোক। নিরিবিলি না পেলে আমার লেখা বেরোয় না। তুই আপাতত কেটে পড়। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরিস।' “বেশ, লেখ।' ভালোমানুষ পরাগ ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

পরাগ বেরিয়ে যাওয়া মাত্র ঘরের দরজা বন্ধ করে পশ্চিম দিকের জানলাটা প্রায় ভেজিয়ে দিয়ে, সামান্য একটু ফাক রেখে তাতে চোখ লাগিয়ে দাঁড়াল দীপক। এই জানলা দিয়ে মুখুজ্যে বাড়ির শিবমন্দির ও সংলগ্ন উঠোন দেখা যায়। দীপক কেদারবাবুর ওপর নজর রেখে অপেক্ষায় রইল।

ক্রমে স্থানীয় ভক্তরা একে একে বিদায় নিলেন। তখন পাইবাসী সেই ভদ্রলোক গিয়ে বসলেন সাধুর কাছে। আর একদল প্রণাম জানিয়ে ভদ্রলোক পকেট থেকে কী জানি একটা বের করে ডান হাতের তালুতে রেখে দেখালেন কেদারবাবুকে। সাধুজি একবার সেটি দেখে নিয়ে ঘাড় নাড়লেন। এরপর দুজনে কী সব কথাবার্তা হল। ওই সময় হরি গেটের কাছে দাড়িয়ে যেন পাহারা দিতে লাগল। সতর্ক চোখে লক্ষ করতে লাগল চারধার। মিনিট দশেক কথার পর পড়ুইবাসী উঠে পড়লেন। ধীরপায়ে বেরিয়ে গেলেন। দেখে অদ্ভুত লাগল, যাওয়ার সময় তিনি সাধুবাবাকে প্রণাম জানালেন না। কেদারবাবাও উঠে ঢুকে গেলেন অতিথিশালায়। | দীপক দুদ্দাড় করে নেমে পরাগের বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলল নিজের বাড়ির দিকে। পথে ছোটনের দেখা মিলে গেল। দীপক ব্যস্ত হয়ে বলল, “ছোটন, স্টেশনে চ। তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি এক ভদ্রলোককে। ওকে ফলো করতে হবে। লক্ষ করবি বাসে না ট্রেনে কীসে ওঠেন? সিউড়ি লাইনের বাসে উঠলে তুইও উঠবি। লক্ষ রাখবি উনি কোথাকার টিকিট কেনেন। দেখা হয়ে গেলে নেমে পড়িস। ফিরতি বাসে এসে আমায় রিপোর্ট করবি। এই নে দু-টাকা। তোকেও তো টিকিট কিনতে হবে যা হোক একটা, আর ফেরার ভাড়া।

ঘণ্টাখানেক বাদে ছোটন এসে জানাল যে সেই ভদ্রলোক সিউড়িগামী বাসে। উঠেছিলেন এবং সিউড়ি অবধি টিকিট কেনেন। ব্যাপারটা দেখে নিয়ে ছোটন বল্লভপুরে নেমে পড়ে।

তাহলে পাইয়ের গল্প মিথ্যে বানানো। লোকটি নির্ঘাৎ কেদারবাবার গ্যাং-এর লোক। কোনো ষড়যন্ত্র করতে এসেছিল। দীপকের মন বলে, আজ রাতেই কিছু একটা ঘটবে। আজ রাতেই আসরে নামবেন কেদারবাবা।

দীপক বিকেলে ছোটনকে বলল, “শোন্‌, আজ রাতে আমি মুখুজ্যে বাড়ির ওপর নজর রাখব লুকিয়ে। কিছু একটা ঘটতে পারে।

‘আমার খুব ভয় করছে কাকু, যদি তেমার বিপদ হয়?'

‘‘রিপোর্টারের কাজে রিস্ক নিতেই হয়, দৃঢ়স্বরে জানাল দীপক, ‘যদি ভোরের মধ্যে বাড়ি ফিরি, তুই বরং থানায় খবর দিস।

দীপক মাকে বলল, 'এক বন্ধুর বাড়িতে গান শুনতে যাব আজ রাতে। কখন ফিরব ঠিক নেই। গেটের তালার ডুপ্লিকেট চাবিটা নিয়ে যাব।'

মুখুজ্যে বাড়ির একধারে সরু গলি। ওই গলির ওপর মুখুজ্যে বাড়ির পাশে এক পুরনো বাড়ির রোয়কে থামের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাড়িয়ে দীপক। রাত প্রায় দশটায় এসেছে। ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। এই উ রোয়াক থেকে মুখুজ্যে বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে মন্দিময় ও চত্বরের  অংশ দেখা যায়।

ক্রমে চারপাশ একেবারে নিঝুম হয়ে আসে। গলিপথে লোক চলাচল থেমে যায় প্রায়। দীপক অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শরীরের খোলা জায়গাগুলি জ্বলে যাচ্ছে মশার কামড়ে। বেশি হাত-পা নাড়তে ভরসা হয় না, পাছে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সন্ধের সময় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভ্যাপসা দুর্গন্ধ উঠছে রাস্তার ধারের ড্রেন থেকে। শছেই ভোবা থেকে ভেসে আসছে অজর ব্যাঙের গলা-সাধার রব। কানে আসছে আরও কিট-পতঙ্গের বিদঘুটে ডাক। অন্ধকার রোয়াকটায় বিষাক্ত গৰু ৰা বিছে মনি ওঠ? বলে বাড়িতে নজার ব্যাওতে বখতে দীপক ক্ষণে ক্ষণে নিজের চারধারে দুটি ছোরায় সাতভাবে। টর্চ জাল, থপায় নেই। আকাশে আধখানা চাদ। তবে মেঘ থাকায় জ্যোৎস্না ফোটেনি মোটে। শিবমন্দিরের আশে পাশে বারকয়েক দেখা গেল ছায়ামূর্তির ঘোরাফেরা, তবে তাদের চেনা গেল না।

সময় যেন আর এগোয় না। উত্তেজনা ও আশঙ্কায় দীপকের শরীর টানটান, নিজের হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি কানে বাজে। আরও অনেকক্ষণ কাটল এই অসহায় অবস্থায়।

সহসা দীপক দেখে মুখুজেদের পাঁচিল টপকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল এক ছায়ামুর্তি। অস্পষ্ট চাদের আলোয় চিনল তাকে, হরি ব্রহ্মচারী। হরি দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে গলিপথ ধরে। সে খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর দীপক অনুসরণ করল তাকে, যথাসম্ভব পথের ধার ঘেঁষে বাড়িগুলির ছায়ার আড়ালে আড়ালে নিঃসড়ে। জুতোটা হাতে নিল, পায়ে শব্দ হয়।

কিছুদূর সোজা গিয়ে বার দুই বাঁক খেয়ে দীপক হাজির হল তালপুকুরের ধারে। জায়গাটা অতি নিজনি। মস্ত পুকুর ঘিরে বড় বড় গাছের তলায় ঘুটঘুটে

অন্ধকার। এর পরেই পথ গিয়েছে রেললাইনের ধারে ধারে।

হরি সহসা অদৃশ্য। তালপুকুরের পাশে আত্মগোপন করল নাকি? ও কি টের পেয়েছে দীপরে পিছু নেওয়া?

বিমূঢ় দীপক খানিক এগিয়ে থেমে যায়। এদিক সেদিক তাকায়। জায়গাটার বদনাম আছে। সন্ধের পর মাঝে সাঝে ছিনতাই হয়েছে এখানে। রেললাইনের কাছে গজিয়ে উঠেছে, একটা ব্যক্তি এবং কিছু সস্তা চায়ের দোকান। রাতে সেসব দোকানে নাকি বাজে লোকেরা আক্ষা হয়। অন্ধকারে ভদজনে তাই এলাকাটা পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। দীপক কয়েক পা ইতস্তত ঘুরে একটা গাছের ছায়ায় নিথর হয়ে দাড়িয়ে থাকে প্রতীক্ষায়। কখন ফের আবির্ভূত হবে হরি? হঠাৎ পেছনে মৃদু খসখস আওয়াজ। ঘাড় ফেরানোর আগেই দীপক প্রচণ্ড আঘাত পেল মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে সে জ্ঞান হারাল।

চেতনা ফিরতে দীপক টের পেল, একটা অন্ধকার ঘরের মেঝেতে সে কাত হয়ে শুয়ে আছে। তার হাত-পা-মুখ বাঁধা। মুখের ভিতর কাপড় গোঁজ। মেঝে এবড়োখেবড়ো। ঘরের একটা জানলা খোলা বা পান্নাহীন। সেখান দিয়ে রাতের আকাশের এক টুকরো দেখা যাচ্ছে। কতক্ষণ কেটেছে কে জানে? মেঘে ঢাকা চাদের ক্ষীণ আভা আকাশে।

ঘরের বাইরে কয়েকজনের চাপা গলার কথাবার্তা দীপকের কানে আসে। 'এই চল আর দেরি করিস নে। ‘এত রাতে ডাকাডাকি করলে বাবু চটে যাবে। ‘তা কী করব? এই ছোঁড়াটাকে নিয়ে কী করব জেনে আসতে হবে তো?”

“আরে ধুর, দে খতম করে। লাশ পুতে দিই। বাবুকে জানার দরকারটা কী? বেটা মহা শয়তান। ফলো করছিল আমাকে। দেখিস বাবুও ঠিক তাই অর্ডার দেবে।'

'না না, তবু জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভালো। শেষমেশ যদি নিজেদের বুদ্ধি কাটিয়ে ঝামেলায় পড়ি? বাবু ফায়ার হয়ে যাবে। নে চল, ওঠ।'

খোলা জানলায় একজনের মুখ উকি মারে ঘরে। বাইরে ফের কথা শোনা যায়, 'বেটার এখৎ জ্ঞান ফেরেনি। চ ঘুরে আসি।

কয়েকজনের পদশব্দ মিলিয়ে যায়।

এবার দীপক প্রাণপণে তার পিছমোড়া করে বাঁধা দুহাত খোলার চেষ্টা শুরু করে। ভীষণ . কঠিন বাঁধন। টানাটানিতে গা কেটে বসে যায় দড়ি তবু বাঁধন আলগা হয় না।

সহসা জানলায় কারও ছায়ামুর্তি। দীপক মুহূর্তে কাঠ। তারপরই টর্চের তীব্র আলোর ঝলক পড়ে দীপকের গায়ে কয়েক পলক্কে জন্য। চোখ ধাধিয়ে গিছল দীপকের। তবু তার ঠাওর হয় জানলায় সাজানো লোকটি হরি। সর্বনাশ, ও নিশ্চয়ই পাহারায় ছিল বাইরে। ঘরে নড়াচড়ার আওয়াজ পেয়ে দেখে গেল। বুঝল যে দীপকের হুঁশ ফিরেছে। জানলা থেকে ছায়ামূর্তি সরে যায়।

দীপক ফের বাঁধন খোলার চেষ্টা করে। খুব নিঃশব্দ। হরি যেন টের না পায়। একবার এই ঘর থেকে বেরুতে পারলে একা হরিকে ঘায়েল করে পালানো তার পক্ষে কিছু কঠিন হবে না। তবে সময় খুব কম। ওদের দলের লোক ফিরে আসার আগেই পালাতে হবে। নইলে হয়তো মৃত্যু আহে অদৃষ্টে।

আরও কিছুক্ষণ কাটে। সহসা বাইরে মোটর গাড়ির আওয়াজ। গাড়িটা থামল এই ঘরের সামনে। ভারি ভারি জুতোর পদধ্বনি এগিয়ে আসে। দীপকের বন্দিশালার দরজার শিকল খোলে-শুনাৎ। জোরালো টর্চের আলোয় উল্লসিত হয় ঘর।কয়েকজন ঢাকে ঘরে। পুলিশ! তাদের একজন বোলপুর থানায় সেকেন্ড অফিসার, কনস্টেবলরাও দীপকে চেনা।

একজন সেপাই চটপট ছুরি দিয়ে দীপরে বাধন কেটে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।—'লেগেছে কোথাও ?' জিজ্ঞেস করেন সেকেন্ড অফিসার।

মাথার পিছন দিকে টনটনে ফোলা জায়গাটায় একবার আঙুল বুলিয়ে দীপক মার্ক নাড়ে, নাঃ, তেমন কিছু নয়। তারপরই সে নিজের ব্যথা ভূলে প্রবল উত্তেজনায় চেচিয়ে ওঠে, ওদের অ্যারেস্ট তে পেরেছেন? ‘কাদের?” অফিসারের প্রশ্ন।

“ওই কেদারবাবা আর তার শিষ্য হরি। ওরা ভণ্ড সাধু। ফলস্। আসলে ডেঞ্জারেস ক্রিমিনাল। হরিকে ফলো করতে গিয়ে আমার এই অবস্থা। ও বাইরে গার্ড দিচ্ছিল।

দীপক হুড়হড় করে বলে যায়, সে কেমন করে বন্দি হল এবং এই ঘরের বাইরে গুণ্ডাগুলোর কথাবার্তা।

সেকেন্ড অফিসার একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এখন আপনি বাড়ি যান। পৌঁছে দিচ্ছি। পরে এ বিষয়ে কথা হবে।'

রেললাইনের ধারে পোড়ো বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসে সবাই।

পুলিশ-জিপ দীপককে তার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। দীপক বাড়ির গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে নিচের তলায় তার ঘরে আলো জ্বলে উঠল। সদর দরজা খুলে দিল ছোটন।

'ছোটন, তুই'! দীপক অবাক। 'আমি জেগেছিলাম কাকু। বড্ড ভয় করছিল, এখনও ফিরছ না কেন? কাকু, তোমার কী হয়েছে?' দীপকের বিপর্যস্ত চেহারা দেখে ঘাবড়ে যায় ছোটন।

‘খুব বেঁচে গেছি রে। কাল বলব সব। এখন তুই শুতে যা। হারে, তুই বুঝি টেলিফোন করেছিলি থানায় আমার দেরি দেখে ?”

‘কই না তো!

‘ও, তাহলে? আচ্ছা তুই যা।'

একটা ব্যথা কমার ট্যাবলেট খেয়ে দীপক শুয়ে পড়ে। মগজে নানান চিন্তা পাক খায়। পুলিশ কীভাবে তার খোঁজ পেল? কিছু একটার সন্ধানে বেরিয়েছে পুলিশ। ব্যাপারটা কী? কেদারবাবার গ্যাং কি ধরা পড়ল? ছটফট করতে করতে ক্লান্ত দীপক কখন ঘুমের ঘোরে ঢলে পড়ে।

দীপকের যখন ঘুম ভাঙল তখন আকাশ বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। রোদ উঠেছে। তাড়াতাড়ি সে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়ল থানার উদ্দেশে। খানিক যেতেই দশরথ গোয়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ। দশরথ বলল, বাবু, শুনেছেন, একগাড়ি পুলিশ এসেছে। নব সামন্তবাবুর বাড়িতে ঢুকেছে। রেললাইনের ধারে কয়েকজন দোকানদারকে ধরেছে।

দীপক হনহন করে চলল সামন্ত বাড়ির দিকে। মুখুজ্যে বাড়ির প্রায় সামনাসামনি বড় রাস্তার ওপরে নব সামন্তর দোতলা বাড়ি। নিচতলায় তার দোকান। নব সামন্তর বয়স প্রায় চল্লিশ, তামাকপাতা ও বিড়ির ব্যবসা আছে। বেশ পয়সাওলা লোক। বোলপুরে নতুন এসেছেন। মাত্র বছর দুই।

যেতে যেতে দীপক ভাবল, নব সামন্তর বাড়িতে পুলিশ কেন? তাহলে মুখুজ্যে বাড়ি নয়, সামন্ত বাড়িতে চুরি বা ডাকাতি করেছে কোরবাবার গ্যাং।

সামন্ত বাড়ি ঘিরে রেখেছে পুলিশ। কৌতূহলী কিছু দর্শক তফাত থেকে দেখছে। বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে আসছে হাঁক-ডাক, বুটজুতো পায়ে অনেকের চলাফেরার শব্দ। সদর দরুজার ঠিক সামনে দাঁড়ানো দুটি লোক দীপকের নজর কাড়ে। দুজনেই আধাবয়সি, বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহী। পরনে তাদের শার্ট, ট্রাউজার্স ও শু্য। ফিটফাট। ভারিক্কি ধরন। একজন দীপকের পরিচিত। সদর শহর সিউড়িবাসী জেলা পুলিশের বড়কর্তা খোদ এস, পি, সাহেব। দীপক টুক করে এস, পি.-র সামনে হাজির হয়ে বলল, নমস্কার স্যার, কী ব্যাপার?'

এস. পি. মাথা ঝাকিয়ে বললেন, 'হ্যাল্লো রিপোর্টার। সার্চ হচ্ছে। ডাগত গাজা আফিম এমনকী হেরোইন রাখত লুকিয়ে। দু'তিনটি ডিস্ট্রিক্টে চালান।

সেয়ানা পার্টি। ঘাঁটিটা বোলপুরে সন্দেহ করেছিলাম। এবার ধরা পড়ল। গ্যাং লিডার সামন্ত সমেত অনেকে অ্যারেস্টেড হয়েছে।

পাশের ভদ্রলোকটিও নিশ্চয় পুলিশ অফিসার। দীপক নমস্কার করল তাঁকে। এস, পি। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—"ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডেপুটি চিফ মিঃ দত্ত। আর ইনি হচ্ছেন একজন রিপোর্টার।।

'জানি, জানি', মৃদু হেসে বললেন মিঃ দত্ত, বঙ্গবার্তার দীপক রায়।'

কৌতুহলী দীপক মিঃ দত্তর পানে অল্পক্ষণ তাকিয়ে থেকেই চমকে উঠল। ভদ্রলোকের

দাড়ি-গোঁফ কামানো, পরিষ্কার মুখ। কিন্তু ওঁর বাঁ চোখের কোণে ওই কালো তিলটা কেন? সঙ্গে সঙ্গে তার নজর চলে যায় দত্তর ডান হাতের তর্জনীর দিকে। সেই অস্বাভাবিক লম্বা তজনী, মধ্যম আঙুলের প্রায় সমান সমান এবং ডান

হাতের কব্জির কাছে একটি পুরনো ক্ষতচিহ্ন। হতভম্ব দীপক অস্ফুট স্বরে বলে ফেলল, ‘কেদারবাবা না?'

‘রাইট’, গম্ভীরভাবে জানালেন মিঃ দত্ত, তবে এখন আমি আর বাবা-টাবা নই, স্রেফ কেদারনাথ দত্ত। এস. পি.-র ঠোটে হাসির ঝিলিক খেলে। আর হরি?” আমতা আমতা করে দীপক। ‘অফ কোর্স পুলিশের লোক। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ। আপাতত সার্চ পার্টির সঙ্গে সামন্ত বাড়ির ভেতরে আছে, বললেন মিঃ দত্ত। দীপক বোঝে, তাকে উদ্ধার করতে কে থানায় খবর দিয়েছিল। স্বয়ং ওই হরি।

আরও একটা রহস্যের কিনারা পায় না দীপক। কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করে নিন দত্তকে, 'স্যার, লোকাল থানা কি জানত আপনাদের আসল পরিচয় ?”

উত্তর হয়, ‘নো, মাত্র গতকাল জেনেছে। আপনার মতো ওরাও আমাদের "" সন্দেহের চোখে দেখছিল। মিঃ দত্তর মুখে চাপা কৌতুক।